নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ

ঈমানী ও জিহাদী তারবিয়াতের পাশাপাশি একজন মুসলিমের প্রায়োগিক নিরাপত্তার শিক্ষা (তারবিয়াহ) গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে যখন যুদ্ধ তীব্রতর হয় ইসলাম ও তার মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে-যারা ইসলামকে মেনে চলে এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা ইসলামকে বিজয় করার জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দেয়। অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের মতোই, নিরাপত্তা তারবিয়াহর লক্ষ্য হলো–একজন মুসলিমকে নিরাপত্তাবান মন-মানসে গড়ে তোলা, শুরু থেকেই তার ভেতর জাগিয়ে তোলা এক প্রখর নিরাপত্তা সচেতনতা। অর্থাৎ, এটি যে কারো প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। হোক সে প্রতিকূল বন্দীশিবিরের কোন এক শাবক, কিংবা আফ্রিকা বা সোমালিয়ার কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত কিশোর। অথবা এক দীপ্তমান যুবক, যে শামের মরু অঞ্চলে ছুটে চলছে, কিংবা খোরাসানের পর্বত শিখরে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলছে, অথবা ইরাকের ঈমানদ্বীপ্ত ভূমিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে। আর সে যদি হয় এক নতুন আগত মুহাজির–যে কেবলমাত্র পা রেখেছে জিহাদের ভূমিতে, অথবা এমন কেউ যে পূর্বে নিরাপত্তার এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলো, তবে তার কর্তব্য হলো-নিরাপত্তার মজলিসে বসে বিষয়গুলি ভালো করে রপ্ত করা এবং নিজেকে অন্তত এতটুকু প্রস্তুত করা–যাতে সে তার দ্বায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়, জিহাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এই নিরাপত্তা সচেতনতা সবার জন্য জরুরী। অনেকে এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে, এটি কেবল নিরাপত্তা শাখায় নিয়োজিতদের কাজ। বরং নিরাপত্তা ব্যর্থতা সেখান থেকেই শুরু হয়, যখন সৈনিক ও সদস্যদেরকে এই ধারণায় প্রোগ্রাম করা হয় যে, নিরাপত্তা কেবল নিরাপত্তাকর্মীদেরই কাজ! অথচ নিরাপত্তা হলো একটি আচরণ, চর্চা, প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম অনুভবের বিষয়। বরং এটি একটি শারঈ দায়িত্ব, যা প্রতিটি মুজাহিদের পালন করা আবশ্যক। হোক সে একজন শরীয়া বিশেষজ্ঞ, কিংবা একজন সামরিক সদস্য। আর গণমাধ্যমকর্মীর জন্য তো আরো বেশি জরুরী। কারণ সে বাইরের এমন এক জটিল জগতের সাথে সম্পৃক্ত যেখানে শত্রুরা তাকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রাখে। তবে নিরাপত্তার তারবিয়াহ দ্বারা আমরা সেই অর্থ বোঝাচ্ছি না, যা ত্বাগুতি শাসকগোষ্ঠীগুলো বোঝায়–যেখানে নিরাপত্তা মানে হলো তাগুতের ভয়, তার কাছে আত্মসমর্পণ, তার অন্যায়ের প্রতি নীরবতা, এবং তার কুফরকে বৈধতা দেওয়া। বরং এর বিপরীতটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা যে নিরাপত্তার কথা বলি এবং মুসলিমদের মাঝে যে নিরাপত্তা সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করি তা হলো এমন এক নিরাপত্তাবোধ, যা কুফরি শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার ভিত্তি তৈরি করে, এবং তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে। অতপর এই ধ্বংসাবশেষের উপরেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। তদ্রূপ, ইসলামের দৃষ্টিতে নিরাপত্তা শিক্ষা আধুনিকতাবাদীদের মতো 'সুশীল নাগরিক' তৈরি করার জন্য নয়। কারণ নাগরিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তাদের জাহেলি সংবিধানে 'সুশীল নাগরিক' মানে সেই ব্যক্তি–যে দুনিয়ায় গা বাঁচিয়ে চলে, নিচু মাথায় থাকে, শিরক বা জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না; বরং সে এই শাসনব্যবস্থার আনুগত্য করে, তার সাথে আপস করে চলে। পক্ষান্তরে, ইসলামের নিরাপত্তা শিক্ষা চায় এমন একজন মুসলিম মুজাহিদ তৈরী করতে–যিনি হবেন সজাগ, চতুর, এবং শত্রুর ছলচাতুরির ব্যাপারে সর্বদা সচেতন; যিনি বিশ্বব্যাপী কুফরের বিরুদ্ধে চলমান প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। কার্যকর দিক থেকে নিরাপত্তা শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মানব উপাদান বা "Human Resource" অর্থাৎ একজন মুসলিম ব্যক্তি। তার নিরাপত্তা দক্ষতাকে এমনভাবে ঝালাই করে নিতে হবে যাতে সে জিহাদের ময়দানে অর্পিত দায়িত্বগুলি দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে। হোক সে দারুল ইসলামে কিংবা দারুল কুফরে। কারণ ব্যক্তি হচ্ছে নিরাপত্তা শিক্ষার 'মূল পুঁজি'। তার উপরেই নির্ভর করে নিরাপত্তার 'লাভ' কিংবা 'লোকসান' যদি সে গাফিল হয় এবং দায়িত্বে অবহেলা করে। শরীয়াহর দিক থেকে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে মুমিনদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ}

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।" [সূরা নিসা: ৭১],অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সতর্কতার পাশাপাশি অস্ত্রসজ্জিত থাকার নির্দেশ দেন। আর লড়াইয়ের ময়দানে তিনি নিষেধ করেন যেন তাদেরকে কোন রকম গাফলতি পেয়ে না বসে কিংবা সশস্ত্র সতর্কতা থেকে যেন বিচ্যুত না হয়। এমনকি সালাতের সময়ও তাদেরকে অস্ত্র ও সতর্কতা হাতছাড়া না করার কথা বলেন। অথচ সালাত হলো মুমিনের চোখের প্রশান্তি, তার খুশু-খুযুর জায়গা এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ....وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}

"যখন তুমি মুমিনদের মাঝে অবস্থান করবে আর তাদের সঙ্গে সলাত কায়িম করবে, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র থাকে।" [সূরা নিসা: ১০২], আজকের দিনে আরো জরুরি। কারণ, এখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত উন্মুক্ত লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হয়েছে। যেখানে শত্রু সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকে-কিভাবে মুজাহিদগণের ক্ষতি করবে এবং তাদের শক্তি খর্ব করবে। যুদ্ধ হয়তো কামানের গোলা থামলেই থেমে যায়, কিন্তু নিরাপত্তা যুদ্ধ কখনও থামে না।

আর নবী ﷺ -এর সিরাতে হিজরতের ঘটনা, আকাবার বায়াত এবং গাযওয়া ও সারিয়্যাহসমূহ দেখলে আপনি সবকিছুতে নিরাপত্তা শিক্ষার বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাবেন। খোলাফায়ে রাশেদিনদের ইতিহাসেও রয়েছে এমন অসংখ্য নিদর্শন–যা প্রথম দাওলাতুল ইসলামের ছায়ায় গড়ে ওঠা একজন সজাগ, সচেতন, নিরাপত্তাবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। ফলে নিরাপত্তা শিক্ষা কোনো আধুনিক আবিষ্কার নয়, বরং তা ইসলামের সেই গৌরবময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা–যেখানে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিরকের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই এই নিরাপত্তা চর্চা ছিল অপরিহার্য। কারণ তাওহীদ ছাড়া মানব জাতির কোন নিরাপত্তা নেই; না দুনিয়াতে, না আখেরাতে।

নিরাপত্তা শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো সুবিশাল ও বিস্তৃত–জিহাদি কর্মকাণ্ডের প্রায় সব সেক্টরের সাথে এটি জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা, যোগাযোগ নিরাপত্তা, তথ্য নিরাপত্তা, ঘাঁটি বা আশ্রয়স্থল নিরাপত্তা, যাতায়াত নিরাপত্তা, বৈঠক নিরাপত্তা, এবং লজিস্টিক বা সরবরাহ চেইনের নিরাপত্তা। আর এই সরবরাহ চেইন আজকাল এমন এক ছিদ্রে পরিণত হয়েছে, যেখান দিয়ে শত্রুরা জিহাদি কাঠামোর ভেতরে ঢুকে পড়ে, এই কাঠামোকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কিংবা নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্য। তাই এসব বিষয়ে মুজাহিদগণের প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরি। অন্ততপক্ষে নিরাপত্তা কৌশলগুলি (Security Methods) ভালো করে রপ্ত করে নিতে হবে, যেন এগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার কাছে না থাকলেও, অন্য কেউ যেন এগুলো দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।

আরো জরুরি বিষয় হলো, একটি স্পষ্ট ও হালনাগাদ নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণ করা, যা অতীতের সেকেলে নিরাপত্তা পাঠের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে। কারণ সেসব পদ্ধতি এখন অনেকটাই অচল, বরং যারা কেবল সেগুলোতেই নির্ভর করে থাকে তারা আজ বিপরীত ফল ভোগ করছে। এই কারণে নিরাপত্তা সচেতনতা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। যার ভিত্তি হবে স্পষ্ট পরিকল্পনা ও নির্দেশনা, যাতে করে মুজাহিদের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ে সুদৃঢ় চেতনা গড়ে ওঠে। এটি কেবল বই-পুস্তক বা তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং সচেতন ও আন্তরিক নিরাপত্তা অভ্যাস–যা বাস্তবে প্রয়োগ হয়। কেউ হয়তো অনেক বই পড়ে শেষ করলো, কিন্তু যদি সে তা প্রয়োগ না করে, তাহলে তার প্রতিরক্ষা শক্তি গড়ে উঠবে না। কার্যকর নিরাপত্তা শিক্ষা মানে হলো–সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া; এবং এর প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যাপারেও কঠোরতা জরুরি। কারণ নিরাপত্তা গাফলতি একটি শর'ঈ লঙ্ঘন ও অবাধ্যতার শামিল, যার পরিণতি কেবল একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পুরো জামা'আহর ওপর পড়তে পারে। নিরাপত্তা শিক্ষার মূল কাজ হলো–ভিতর ও বাইরের হুমকি থেকে জামা'আহকে সুরক্ষিত রাখা, যাতে জামা'আহর স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ও পথচলা বজায় থাকে। এটি উপেক্ষা করা মানেই সেই স্থিতি ভেঙে ফেলা, কাঠামো দুর্বল করে ফেলা, এবং পূর্বের সকল আত্মত্যাগ ও রক্ত বৃথা করে দেওয়া।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, নিরাপত্তা শিক্ষা হলো একটি শার'ঈ দায়িত্ব এবং মাঠপর্যায়ের অতীব জরুরী বিষয়, যা মুজাহিদকে শুরু থেকেই শেখা উচিত। এমনকি মুজাহিদগণের সারিতে যোগদানের পূর্বে সে যখন সমর্থনের (মুনাসির) স্তরে থাকে, তখন থেকেই এই নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। যেন নিরাপত্তা তার স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়–সুখে-দুঃখে, চাপেও ও প্রশান্তিতে, সর্বাবস্থায়। তবে এটি তখনই সম্ভব, যখন সে নিজে বুঝবে যে এই দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কতটা বিপজ্জনক এক জায়গা সে পাহারা দিচ্ছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম হেফাজতকারী এবং সবচেয়ে বড় রহমতওয়ালা।